Syllabus For BCS (Written) Examination
Bangladesh Affairs -2 (Compulsory)
Subject Code: 005

Chapter	Topic	Page
04	Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation	124
	GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.	125
07	**The Constitution of the People's Republic of Bangladesh**	
	Preamble	08
	Features	07
	Directive Principles of State Policy	11
	Constitutional Amendments	19
08	**Organs of the Government**	
	Legislature	60
	Representation, Financial and Oversight functions	60
	Rules of Procedure	61
	Law-making	63
	Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat	67
	Executive	38
	Chief and Real executive e.g. President and Prime Minister, Cabinet	38
	Powers and Functions, Council of Ministers, Bureaucracy, Secretariat	50
	Rules of Business, Law enforcing agencies	57
	Administrative setup- National and Local Government structures	43
	Decentralization Programmes and Local Level Planning	54
	Judiciary	68
	Structure: Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Organization of Sub-ordinate Courts	69
	Appointment, Tenure and Removal of Judges; Judicial Review, Adjudication	73
	Separation of Judiciary from the Executive	75
	Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR)	78

Chapter	Topic	Page
09	**Foreign Policy and External Relations of Bangladesh**	
	Goals	214
	Determinants and policy formulation process	215
	Factors of national power, security strategies	222
	Geo-politics and environment issues	219
	Economic diplomacy, Man-power exploitation	220
	Participation in international organizations, UNO and UN peace keeping missions	234
	NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc	238
10	**Political Parties**	
	Historical development	85
	Leadership	96
	Social bases; structure	90
	Ideology and programmes, factionalism	89
	Inter and intra-party relations, politics of alliances, electoral behaviour	91
	Parties in Government and Opposition	91
11	**Elections in Bangladesh**	
	Management of electoral politics	105
	Role of the Election Commission	107
	Electoral Law	113
	Representation of People's Order (RPO)	113
	Election observation teams	115
13	**Non-formal Institutions**	
	Role of Civil Society	97
	Interest Groups	94
	NGOs in Bangladesh	100
14	Globalization and Bangladesh	199
	Economic and Political Dimensions	202
	Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners, Multi National Corporations (MNCs)	200

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: বাংলাদেশের সংবিধান	
১.১	সংবিধানের পরিচয়	০৪
১.২	বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস	০৫
১.৩	বাংলাদেশের সংবিধান	০৬
১.৪	সংবিধানের প্রস্তাবনা	০৮
১.৫	১ম ভাগ: প্রজাতন্ত্র	০৯
১.৬	২য় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	১১
১.৭	৩য় ভাগ: মৌলিক অধিকার	১৪
১.৮	৯ম-ক ভাগ: জরুরি বিধানাবলি	১৮
১.৯	১০ম ভাগ: সংবিধান সংশোধন	১৯
১.১০	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ	২০
১.১১	সংবিধানের তফসিলসমূহ	২১
১.১২	সংবিধানের সংশোধনীসমূহ	২২
	অধ্যায়-০২: বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসংগঠন	
২.১	রাষ্ট্র	৩৬
	নির্বাহী বিভাগ	
২.২	রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী	৩৮
২.৩	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	৪৩
২.৪	বাংলাদেশের প্রশাসন	৫০
২.৫	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার	৫৩
২.৬	নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা	৫৭
	আইন বিভাগ	
২.৭	বাংলাদেশের আইনসভা: জাতীয় সংসদ	৬০
	বিচার বিভাগ	
২.৮	বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা	৬৮
২.৯	বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট	৬৯
২.১০	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	৭৩
২.১১	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি	৭৯
	অধ্যায়-০৩: গণতন্ত্র, রাজনীতি ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান	
৩.১	গণতন্ত্র	৮৫
৩.২	রাজনৈতিক দল	৮৭
৩.৩	সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক	৯১
৩.৪	চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	৯৪
৩.৫	নেতৃত্ব	৯৬
৩.৬	সুশীল সমাজ	৯৭
৩.৭	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা	১০০

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৪: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	
৪.১	নির্বাচন ব্যবস্থা	১০৫
৪.২	নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব	১০৭
৪.৩	বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন	১০৯
৪.৪	নির্বাচনি আচরণবিধি	১১৩
৪.৫	পর্যবেক্ষকের ভূমিকা	১১৫
৪.৬	সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকার, নাগরিক ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা	১১৭
	অধ্যায়-০৫: অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	
৫.১	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১২৪
৫.২	অর্থায়ন	১৩০
৫.৩	বাজেট	১৩৩
৫.৪	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১৩৪
৫.৫	বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৩৬
৫.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৩৮
৫.৭	মেগা প্রকল্প	১৪২
	অধ্যায়-০৬: অর্থনৈতিক খাত	
৬.১	বাংলাদেশের কৃষিখাত	১৫৪
৬.২	বাংলাদেশের শিল্পখাত	১৬২
৬.৩	বাংলাদেশের সেবাখাত	১৭৯
	অধ্যায়-০৭: বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন	
৭.১	বাণিজ্য	১৮৪
৭.২	বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য	১৮৫
৭.৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য উন্নয়ন	১৮৮
৭.৪	বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ	১৯৪
৭.৫	বিশ্বায়ন	১৯৯
৭.৬	শঙ্কা ও সম্ভাবনার অর্থনীতি	২০২
	অধ্যায়-০৮: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্ক	
৮.১	পররাষ্ট্রনীতি	২১১
৮.২	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি	২১৪
৮.৩	ভূ-রাজনীতি	২১৯
৮.৪	দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক	২২২
৮.৫	আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ	২৩৪
৮.৬	আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ	২৩৮
	মডেল টেস্ট	
	মডেল টেস্ট (০১-০৪)	২৪৩

অধ্যায় ০৪

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। (ক) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কী? [৪৩তম বিসিএস]
(খ) বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
(গ) বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বাবলি বর্ণনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

০২। (ক) জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিও) বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস]
(খ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
(গ) সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা কী ভূমিকা পালন করতে পারে? [৪১তম বিসিএস]

০৩। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রসারে নির্বাচনি কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

০৪। দুর্নীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচনি ব্যয় হ্রাসকরণ একটি মহৌষধ- মতামত দিন। [৩৭তম বিসিএস]

০৫। বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলসমূহের ভূমিকা/গুরুত্ব বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

০৬। স্থানীয় সরকার পৌরসভা নির্বাচন বিধিমালা-২০১৫ বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

০৭। "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬" পর্যালোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

০৮। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? এর প্রধান কাজ কী কী? [৩৫তম বিসিএস]

০৯। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আইনে একজন সংসদের জন্য নির্বাচনি ব্যয়ের একটি ধারাবাহিক পরিবর্তন চিত্র তুলে ধরুন। [৩৫তম বিসিএস]

১০। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কী? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

১১। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও উহার কার্যাবলি আলোচনা করিয়া উহাতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি? [৩২তম বিসিএস]

১২। সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কী কী? সংসদ সদস্যের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা যায়? [৩১তম বিসিএস]

১৩। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা নির্বাচনে গুরুত্ব আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]

টীকা

০১। 'The Representation of Peoples' Order (RPO) [৩৬তম বিসিএস]

৪.১ নির্বাচন ব্যবস্থা

নির্বাচন

প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সরকার গঠন করে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার বিকাশের পাশাপাশি নির্বাচন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হতে থাকে। ইতঃপূর্বে ভোটাধিকার কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ড সর্বপ্রথম মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করে। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ইংল্যান্ডে ১৮৯৮ সালে কেবল ত্রিশ বা তদূর্ধ্ব নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে আইনের সংস্কার সাধন করে দেশটিতে নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স সীমা কমিয়ে পুরুষের সমান করা হয়।

কোনো পদে দায়িত্ব পালনের জন্য ভোটের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে। যেমন, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য, সংসদ সদস্যদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের প্রাণভ্রমরা হলো নির্বাচন। মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিপরীতে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিন্দু হলো নির্বাচন। ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যথার্থই বলেছিলেন- At the bottom of all the tributes paid to democracy is he uttle man, walking into the little booth, with a little pencil, making a little cross on a little bit of paper- no amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of that point. বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। সাধারণভাবে নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটারগণ সরাসরি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণ সরাসরি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন না করে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচক সংস্থা বা electoral college গঠন করে।

নির্বাচনের ধারণা

নির্বাচন: যে পদ্ধতিতে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকেরা তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে নির্বাচন বলে।

নির্বাচনি এলাকা: নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এরূপ নির্দিষ্ট এলাকাকে নির্বাচনি এলাকা বলে।

নির্বাচন কমিশন: নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে তাকে নির্বাচন কমিশন বলে।

নির্বাচনি প্রক্রিয়া: যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় তাকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া বলে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ড নির্বাচনি প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে।

ভোট: জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে ভোট বলা হয়।

ব্যালট পেপার: প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অতি গোপনীয়ভাবে ভোটদানের ব্যবস্থা হিসেবে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যালট পেপার বা ভোটপত্র বলে।

সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার গঠনের পক্ষে বাংলাদেশে একটি প্রবল জনমত রয়েছে। পক্ষপাত মুক্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন' নামে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারের নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।
২. সংবিধানের ১২২(১) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা পেশার ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিভাজন করা হয়নি। সকলের সমান ভোটাধিকার নিশ্চিত করা রয়েছে।
৩. নির্বাচনে ভোটারগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে।
৪. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১১৯(১)(ঘ) অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন এবং প্রত্যেক ভোটারগণকে ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এই পরিচয় পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।
৫. সংসদীয় নির্বাচনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।
৬. সম্প্রতি (১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪) হাইকোর্ট এর রায়ের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক এলাকার জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো নাগরিককে ভোটাধিকার লাভের জন্য ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২. ভোটার তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে;
৩. কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে চলবে না;
৪. নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ এলাকার অধিবাসী বলে বিবেচিত হতে হবে।

৪.২ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সর্বোচ্চ ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে থাকেন এবং তাদের কার্যকাল কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। উল্লেখ্য, সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন সংস্কার কমিশন জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (NCC) মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। তবে কমিশনারগণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। আবার অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন, তবে তার জন্য সাংবিধানিক পন্থা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮, ১১৯ ও ১২৬ অনুচ্ছেদে এবং ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিবৃত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী নানারকম কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **ভোটার তালিকা প্রণয়ন:** সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের জন্য ১১৯ (১) (ঘ) অনুসারে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে থাকে। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে নির্বাচন কমিশন।
- **নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ:** সংবিধানের ১১৯ (১) (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণ করে থাকে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনি এলাকার জনসংখ্যা, আয়তন, ভূ-খণ্ডগত অবস্থান বিবেচনা করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়।
- **মনোনয়নপত্র বাছাই:** নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারা অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচার করে থাকে।
- **নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা:** নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করে। সেই সাথে মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রত্যাহারের সময়, বাছাইয়ে বাতিল প্রার্থীদের আপিলের সময়সীমা, ভোট গ্রহণের সময় ও তারিখ, ভোট গণনার উপায় ও স্থান, নির্বাচনের নিয়ম-কানুন, নির্বাচনি প্রচারের বিধান প্রভৃতি নির্ধারণ নির্বাচনি তফসিলের অংশ হিসেবে।
- **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** আরপিও (RPO) এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দান করে। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই, নির্বাচন তদারকি, আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় দেখাশোনা করে।
- **সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান:** সংবিধানের ১১৯ (১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জাতীয় সংসদ। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদের মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙে যাবার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙে যাবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- **ভোটগ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ:** নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ভোটগ্রহণ করে। ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ভোট গণনা, ফলাফল একত্রীকরণ এবং গেজেট আকারে তা প্রকাশ করে।
- **বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ:** প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি আইন ভঙ্গ, নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীয় বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বিচারক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইকৃত অযোগ্য প্রার্থী আপিল করলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তিও করে নির্বাচন কমিশন। আপিল এর ৭৪ ধারার বেআইনি আচরণের জন্য জরিমানা ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে।
- **নির্বাচিত সদস্যদের অযোগ্যতা যাচাই:** কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর অযোগ্যতা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে তা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হয় এবং নির্বাচন কমিশন তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘোষণা করে। এ বিষয়ে সংবিধানের ৬৬ (৪) অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "কোনো সংসদ সদস্য তার নির্বাচনের পর অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হয়েছেন কি না কিংবা এ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।"
- **রাজনৈতিক দল নিবন্ধন:** নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন এবং তা গেজেট প্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অধীন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৬৩টি। সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি'।

উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা ছাড়া ও সংবিধান ও অন্যকোনো আইন নির্বাচন কমিশনের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করলে নির্বাচন কমিশন তা পালন করবে। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

নির্বাচন কমিশনার

সংবিধান ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দানের জন্য জাতীয় সংসদে 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২২' পাশ হয়। এ আইনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন, কমিশনারগণের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে।

অনুসন্ধান কমিটি

রাষ্ট্রপতি ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করবার জন্য। অনুসন্ধান কমিটির মধ্যে থাকবেন-

ক. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি এর সভাপতি হবেন।
খ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক।
গ. বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
ঘ. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং
ঙ. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন বিশিষ্ট নাগরিক যাদের একজন নারী হবেন।

উল্লেখ্য, অন্যূন ৩জন সদস্য উপস্থিতিতে অনুসন্ধান কমিটির সভার কোরাম গঠিত হবে।

অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- অনুসন্ধান কমিটি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবে এবং আইনে বর্ণিত যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও সুনাম বিবেচনা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করবে।
- অনুসন্ধান কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করবে এবং এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী সংগঠনের নিকট হতে নাম আহ্বান করতে পারবেন।
- অনুসন্ধান কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে রাষ্ট্রপতির নিকট ২ জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে। সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

নির্বাচন কমিশনারের যোগ্যতা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তাঁর নিম্ন লিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া
খ. বয়স ন্যূনতম ৫০ বছর হওয়া
গ. কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বিচার বিভাগীয়, আধা-সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত পদে বা পেশায় কমপক্ষে ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা।

নির্বাচন কমিশনারের অযোগ্যতা

'প্রধান নির্বাচনি কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২' অনুসারে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অযোগ্যতা নিম্নরূপ:

ক. কোনো উপর্যুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত অপ্রকৃতিস্থ।
খ. দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করা।
গ. বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করা বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করা।
ঘ. নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া।
ঙ. ১৯৭২ সালের দালাল আইনের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হওয়া।
চ. আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ও পদত্যাগ

নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ পদ্ধতি সংবিধানের ১১৮ (৫) অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হন, নির্বাচন কমিশনারও সেই কারণে ও পদ্ধতিতে অপসারিত হবেন। কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করবেন।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। সে বছরই প্রথমবার ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮' অনুসারে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেতে একটি দলকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হলো-

১. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেকোনো জাতীয় নির্বাচনের আগ্রহী দলটির যদি অন্তত একজন সংসদ সদস্য থাকেন; অথবা
২. যেকোনো একটি নির্বাচনে দলটির প্রার্থী অংশ নেওয়া আসনগুলোয় মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ পায়; অথবা
৩. দলটির যদি একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দেশের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর কমিটি থাকে এবং অন্তত ১০০টি উপজেলা/ মেট্রোপলিটন থানায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থন সংবলিত দলিল থাকে।

এছাড়াও 'রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০' অনুসারে সকল পর্যায়ের কমিটির ন্যূনতম শতকরা ৩৩% সদস্যপদ মহিলার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

- নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের লক্ষ্যে ১০% জেলা এবং ৫% উপজেলা/থানায় দলের অফিস এবং ন্যূনতম ৫,০০০ সদস্য থাকার বিধান করা।
- দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি এবং তা থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা।
- দলের সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের জন্য দলের তিন বছর সদস্য পদ থাকা বাধ্যতামূলক।
- পর পর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান করা।

৪.৩ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন

একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি ছকে তা দেখানো হলো:

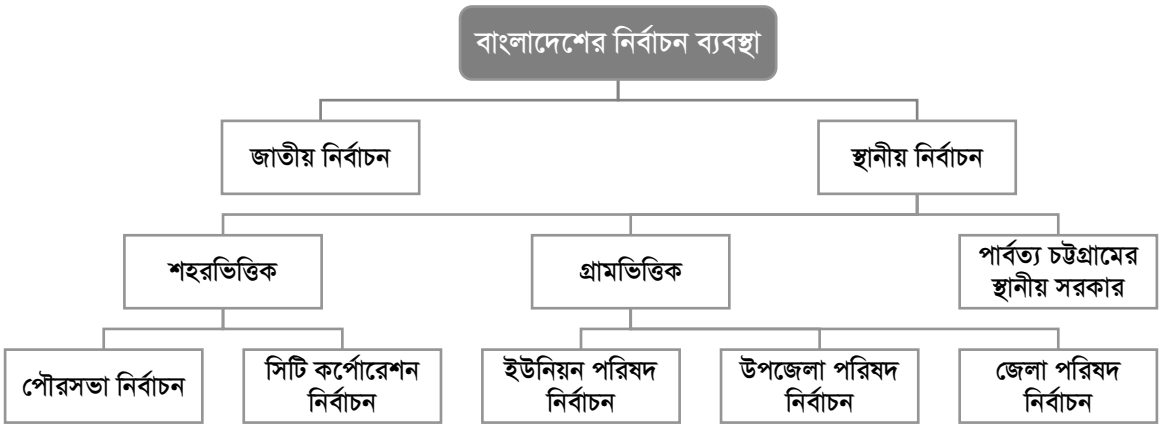

এসকল নির্বাচন ছাড়াও সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন- এসব নিয়েও আলোচনা করা হবে।

জাতীয় নির্বাচনসমূহ

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বারো বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া জনগণের ভোটে তিন বার (১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, তিন বার (১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১) গণভোটসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে একনজরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো দেখানো হলো:

নির্বাচন	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	ফলাফল
১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭ মার্চ, ১৯৭৩	৩০০টি আসনের ২৯৩ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ
২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯	৩০০টি আসনের ২০৭টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জয় লাভ
৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭ মে, ১৯৮৬	৩০০ আসনের ১৫৩ টিতে জাতীয় পার্টির জয় লাভ
৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩ মার্চ, ১৯৮৮	৩০০ আসনের জাতীয় পার্টি ২৫১ টিতে জাতীয় পার্টির জয় লাভ
৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	৩০০টি আসনের ১৪০ টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জয় লাভ
৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬	৩০০টি আসনের ২৭৮টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জয় লাভ
৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১২ জুন, ১৯৯৬	৩০০টি আসনের ১৪৬ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ
৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ অক্টোবর, ২০০১	৩০০টি আসনের ১৯৩ টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জয় লাভ
৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮	৩০০টি আসনের ২৩০ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ
১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৫ জানুয়ারি, ২০১৪	৩০০টি আসনের ২৩৪ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ
১১শ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩০০টি আসনের ২৫৭ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ
১২শ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	০৭ জানুয়ারি, ২০২৪	৩০০টি আসনের ২২৪ টিতে আওয়ামী লীগের জয় লাভ

স্থানীয় নির্বাচনসমূহ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে স্থানীয় বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের কল্যাণ সাধন, উন্নয়নমূলক কাজ, স্থানীয় পর্যায়ে কর ধার্য ও আদায়ের কাজ ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্য স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ধাপে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা কাজ করেন। স্থানীয় সরকারের ৩টি আলাদা কাঠামো রয়েছে যথা: ১. গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার ২. শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার।

গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারের নির্বাচন

বাংলাদেশের ৮০% অঞ্চল গ্রাম। আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকারের ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা– (ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) উপজেলা পরিষদ (গ) জেলা পরিষদ।

(ক) **ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন:** 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯' অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকেন যিনি ঐ ইউনিয়নের ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। পাশাপাশি ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১৩ জন প্রতিনিধি সবাই প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

(খ) **উপজেলা পরিষদ নির্বাচন:** 'উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮' অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান ও ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়াও উপজেলার অধীনে থাকা সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন।

(গ) **জেলা পরিষদ নির্বাচন:** 'জেলা পরিষদ আইন, ২০০০' অনুযায়ী প্রতি জেলায় ১৫ জন সাধারণ সদস্য এবং ৫ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থাকার বিধান ছিল। এটি সংশোধন করে 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল-২০২২' এর মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা থেকে (জেলার মোট উপজেলার সমসংখ্যক) একজন করে সদস্য এবং চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যা) তবে কমপক্ষে ২ জন নারী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে একমাত্র জেলা পরিষদের সদস্যরাই সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না। জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রগণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিটি কর্পোরেশন মেয়রের প্রতিনিধি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে কাজ করেন। 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' অনুযায়ী, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে বা জনস্বার্থে সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যগণকে সরকার অপসারণ করতে পারবে এবং কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠন করতে পারবে।

উল্লেখ্য, সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইউনিয়ন ও উপজেলাকে প্রশাসনিক ও একাংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকারের নির্বাচন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকারের দুইটি কাঠামো রয়েছে। যথা– (ক) পৌরসভা (খ) সিটি কর্পোরেশন।

(ক) পৌরসভা নির্বাচন: পৌরসভা হলো শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর। ২০০৯ সালের পৌরসভা আইন অনুসারে, কোন এলাকার জনসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি হলে, শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমি অকৃষি প্রকৃতির হলে, জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত থাকলে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৫০০ এর বেশি হলে তাকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় মেয়র। প্রতিটি পৌরসভা কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। পৌরসভার পরিষদে একজন মেয়র, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর থাকবে। 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' অনুযায়ী, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে বা জনস্বার্থে সকল পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিলরগণকে সরকার অপসারণ করতে পারবে এবং কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠন করতে পারবে।

(খ) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: পৌরসভা এলাকায় নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে মেয়র ও সদস্যদের কাউন্সিলর হিসেবে অভিহিত করা হয়। মেয়র ও কাউন্সিলর উভয়ই সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' অনুযায়ী, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে বা জনস্বার্থে সকল সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র অথবা কাউন্সিলরগণকে সরকার অপসারণ করতে পারবে এবং কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠন করতে পারবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি পার্বত্য জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে বিশেষ স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য ৩টি জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিটিতেই একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যান ও ৩০ জন সদস্য থাকে। তবে প্রতিটি জেলায় উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্য সংখ্যা ভিন্ন হয়। এই চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ পার্বত্য অঞ্চলের এই ৩ জেলার নিবন্ধিত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

অন্যান্য নির্বাচন

জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন ছাড়াও বাংলাদেশে আরো কিছু পদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন:

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয় ব্যবস্থার কারণে বহুবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান চালু করা হয়। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমানে সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত না হলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় থাকে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন

সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে বর্তমানে ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে। সংসদের আসনের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত এই মহিলা আসনে রাজনৈতিক দল বা জোটগুলো তাদের নির্ধারিত আসনের জন্য একক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় তারা বিনা ভোটে নির্বাচিত হন। আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয়।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন আইন-২০০৪ অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের মতো সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করতে হয়। আইন অনুযায়ী শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যরাই সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে ভোটার হবেন এবং এই ভোটাররা কেবল নিজেদের দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে বণ্টিত আসনে একক প্রার্থী হলে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু বণ্টিত আসনের তুলনায় ওই দল বা জোটের প্রার্থী বেশি হলে ভোট নিতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীরাই নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। উল্লেখ্য, সংবিধান সংস্কার কমিশন জাতীয় সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষের মোট আসন সংখ্যা ৪০০ করার সুপারিশ করেছেন, যার মধ্যে নারী আসন সংখ্যার হবে ১০০টি। যেখানে দেশের সকল জেলায় নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকে থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

গণভোট

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৩ বার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলো হলো:

ক্রম	তারিখ	উদ্দেশ্য	ফলাফল	
			হ্যাঁ %	না %
প্রথম	৩০ মে, ১৯৭৭	জিয়াউর রহমানের নিজ শাসনকে বৈধকরণ	৯৮.৯	১.১
দ্বিতীয়	২১ মার্চ, ১৯৮৫	জেনারেল এরশাদের সমর্থন যাচাই	৯৪.৫	৫.৫
তৃতীয়	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন প্রস্তাব	৮৪.৩৮	১৫.৬২

২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪৭ ধারা বাতিল ঘোষণা করে। এর ফলে ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে ১৪২ অনুচ্ছেদে যেভাবে গণভোটের বিধান সংযুক্ত হয়েছিল সেভাবেই তা পুনর্বহাল হলো। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ৪র্থ গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

গণভোট সংক্রান্ত বিধান

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোট সংক্রান্ত বিধান যেভাবে সংযুক্ত ছিল-

সংবিধানে প্রস্তাবনার অথবা ৮, ৪৮ বা ৫৬ অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধানাবলির সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি গণ-ভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। ভোটের ফলাফল যেদিন ঘোষিত হয় সেইদিন প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, অথবা প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদানে বিরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে কমিশন এবং রাজনৈতিকদলসমূহ বার বার বৈঠক করে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হয় এবং ১৭ অক্টোবর 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' স্বাক্ষরিত হয়। এই সনদের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো কার্যকর করতে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। এই বাস্তবায়ন আদেশ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য গণভোটের বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ 'গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে। গণভোট নিম্নরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে-

"আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?"; (হ্যাঁ/ না):

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

৪.৪ নির্বাচনি আচরণবিধি

বাংলাদেশের নির্বাচনি আইন

নির্বাচনি আইন নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনি আইনের লক্ষ্য। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণীত হয়েছে। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়ে নির্বাচনি আইন ও বিধিমালা গঠিত।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইনসমূহ

ক্রমিক	শিরোনাম
১	THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ORDER, 1972
২	THE MEMBERS OF PARLIAMENT (DETERMINATION OF DISPUTE) ACT, 1980
৩	THE MEMBERS OF PARLIAMENT (DETERMINATION OF DISPUTE) ACT, 1980 (ACT NO. I OF 1981)
৪	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন ২০০৪
৫	রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা,২০২৫ (১০-১১-২০২৫)
৬	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (প্রতীক) ৩০-১০-২০২৫
৭	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর গেজেট (১৮-০৯-২০২৩)
৮	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত গেজেট (২৭-০৯-২০২৩)
৯	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১০	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (২৪-১১-২০১৩)
১১	সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮
১২	THE DELIMITATION OF CONSTITUENCIES ORDINANCE, 1976
১৩	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018 (৩১-১০-২০১৮)
১৪	রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৫	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৬	রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)
১৭	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (৭-১১-২০১৮)

স্থানীয় সরকার নির্বাচন আইন

এছাড়াও স্থানীয় সরকার (যেমন: সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি) এর পরিচালনার জন্য আলাদা নির্বাচনি আইন রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২/ 'The Representation of People' Order (RPO)

The Representation of People Order (RPO) এর বাংলা নাম গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)। এটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিধি বিধান সম্পর্কিত প্রদান আইন। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৫৫ নম্বর আদেশ হলো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ। এ আদেশটি ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং তা আইনের মর্যাদা লাভ করে। জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এ পর্যন্ত মোট ১৪ বার সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনীটি পাশ হয় ২০২৫ সালে। এটিকে গণপ্রতিনিধিত্ব (RPO) ১৯৭২ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে। এ আদেশ নির্বাচন কমিশনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনায় ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ বাংলাদেশের নির্বাচনি প্রধান আইন। এই আইনের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধিবিধান পরিচালিত হয়। নিচে এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।
- আদেশের ৫ ধারাবলে নির্বাচন কমিশন যেকোনো ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন।
- ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনি এলাকার সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের উপর ন্যস্ত। সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী।
- নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনি ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যেকোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল তৈরির কথা বলা হয়েছে।
- ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
- ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে।
- ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে।
- ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত হয়েছে।
- ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।
- ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যেকোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।
- আদেশের ১৭ (১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে।
- ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে।
- ২০ ধারায় নির্বাচনি এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে।
- ২০ (২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোস্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে।
- ২১ (১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট এবং ২১ (২) ধারায় পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।
- ২৭ (২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।
- আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭ (৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে।
- ৩৯ (১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন।
- ৪৪-ক ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেবেন।
- ৪৪-খ ধারার (৩) উপধারায় প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা (সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) নির্ধারিত হয়েছে।
- ৪৪-গ ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টদের নির্দেশ দেবেন।
- ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যেকোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।
- আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪-ক ও ৪৪-খ এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুস গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসংগত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুস গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

- ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা এবং নির্বাচন পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
- ৮০ ধারায় ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)।
- ৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সিলমোহর ভেঙে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধা দান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)।
- আদেশের ৮৪ ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন (কগনিজিবল অফেন্স)।
- ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।
- ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যেকোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন।
- ৯১-খ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করতে পারবেন। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই তদন্ত পরিচালনা করবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO) ১৯৭২ সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনগুলি নিম্নরূপ-

(১) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জোটগতভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
(২) 'না' ভোট যুক্ত করা হয়েছে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকে।
(৩) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এর অপব্যবহারকে নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
(৪) আদালত ঘোষিত ফেরারি আসামি প্রার্থী হতে পারবেন না।
(৫) আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ, বিমান ও কোস্ট গার্ড) যুক্ত করা হয়েছে।
(৬) সমান ভোট পেলে লটারির বদলে হবে পুনঃভোট।
(৭) নির্বাচনি জামানত ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
(৮) আচরণ বিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
(৯) আইটি সাপোর্টে পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছে।
(১০) হলফনামায় অসত্য তথ্য দিলে নির্বাচিত হওয়ার পরও ইসি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৪.৫ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালে "নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫" প্রণয়ন করে। এটি অনুসারে-

নির্বাচন পর্যবেক্ষক: নির্বাচন পর্যবেক্ষক অর্থ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অধীন নির্বাচনসহ নির্বাচন কমিশনের অধীন যেকোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা পর্যবেক্ষকগোষ্ঠী;

পর্যবেক্ষক সংস্থা: পর্যবেক্ষক সংস্থা অর্থ কোনো সংস্থা যা বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশিপ গঠন করলে, ঐ গ্রুপ বা পার্টনারশিপকে একক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে। বাংলাদেশের কয়েকটি পর্যবেক্ষক সংস্থার নাম হলো- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ডেমোক্রেসি ওয়াচ, ব্র্যাক, অবজার্ভার সোসাইটি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো হলো- European Union (EU), United Nation (UN), এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা (APEC), এশিয়ান নির্বাচন সহযোগিতা (ACE), কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

নির্বাচনি এলাকা: নির্বাচনি এলাকা অর্থ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে - সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো সংসদীয় এলাকা এবং উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত এলাকা।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য

'নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫' অনুসারে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

- সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কেনো ত্রুটিবিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া; এবং
- নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনি উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাতে করে ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনি পরিবেশ এবং তার ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা।
- পর্যবেক্ষণের উপস্থিতিতে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোটারের আস্থা এবং ভোটের ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নির্বাচন অধিকতর ভালো করা।

পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব

পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে-

(১) ক. পর্যবেক্ষক সংস্থা নির্বাচনের সময়সূচি জারি হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক তা উল্লেখপূর্বক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করা;
খ. আবেদনের সাথে এলাকা ভিত্তিক পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রদান করা;
গ. নির্বাচন কমিশন থেকে অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই উক্ত সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকায় মোতায়েন করার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করে তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া;
ঘ. রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন জমা দেয়ার সময় প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ফরম EO-2 এবং ফরম EO-3 (অঙ্গীকারনামা) দাখিল করা।

(২) এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ এলাকা (যেমন- উপজেলা/ থানা/সংসদীয় এলাকা) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়;

(৩) নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলি ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক টিমের পর্যবেক্ষণ এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া;

(৪) প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা;

(৫) প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাতে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা;

(৬) কোন পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুসরণ করছে কিনা তা জানবার জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলি মনিটরিং করা। কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তা দ্রুত তদন্ত করে দেখবে এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে মিশন হতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করা।

পর্যবেক্ষকের যোগ্যতা

পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হইবে-

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- বয়স ২১ (একুশ) বা তদূর্ধ্ব হতে হবে;
- ন্যূনতম এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে;
- কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হতে পারবে না;
- কোনো নিবন্ধিত বা অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হতে হবে;
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা ফরম EO-3 স্বাক্ষর এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলতে হবে;
- পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না;
- কোন রাজনৈতিকদল বা এর কোন অঙ্গসংগঠনের সাথে কোনোভাবে যুক্ত কেউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না।

পর্যবেক্ষকদের করণীয়

- কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড সার্বক্ষণিকভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন যাতে তা সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়;
- পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজে যাতে বিঘ্ন না হয় সে বিষয়ে মনোযোগী থাকবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। যেখানে অবস্থান করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় স্বল্পসময়ের জন্য অবস্থান করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
- কোনো অবস্থাতেই কোনো পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের গোপন কক্ষে (marking place) প্রবেশ করতে পারবেন না;
- প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসংগত আচরণ সম্পর্কে তার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করবেন।

৪.৬ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার, নাগরিক ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, সাংবিধানিক ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো বৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে কঠিন। নির্বাচনের প্রাণ হলো ভোটার অর্থাৎ জনগণ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণের সহযোগিতাও অপরিহার্য। নিম্নে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

হস্তক্ষেপ না করা

বাংলাদেশে বিতর্কিত নির্বাচনের মূল কারণ হলো সরকারের হস্তক্ষেপ। সরকার অনেক সময় বিভিন্নভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশন গঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মতো বিষয়গুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ এর নজির দেখা যায়। এসবের ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে। তাই প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দলের উচিত নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ

নির্বাচন কমিশনে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। জনবল ঘাটতির কারণে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো পরিচালনা করতে বেগ পেতে হয়।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ

বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক আইন ও বিধি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই এর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। এর একটি কারণ তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সচেতন না হলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো অসম্ভব।

নাগরিকের ভূমিকা

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই প্রার্থী তাঁরাই ভোটার। ফলে নাগরিকগণ যদি সচেতন ও সৎভাবে দায়িত্ব পালন করে তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সহজ হয়। নিচে এ ব্যাপারে নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমিশনকে সহযোগিতা

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি ও মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা রাখে। নিকটবর্তী নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ভোটার নিবন্ধনের কাজ হয়ে থাকে। তাই ১৮ বা তার বেশি বয়সের সকল নাগরিকের উচিত সেখানে গিয়ে ভোটার নিবন্ধন করা।

নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ করা

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সাধারণ জনগণ নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চললে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি মাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব খাটিয়ে আচরণবিধি ভঙ্গ করে। যেমন অর্থ ও পেশি শক্তির ব্যবহার, যত্রতত্র পোস্টার লাগানো, যখন তখন মাইকে প্রচার, অবৈধ অস্ত্র বহন ছাড়াও নানাভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে। সচেতন নাগরিকদের উচিত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

বিবেকবান ভোটার হওয়া

সচেতন ও বিবেকবান ভোটার দেশের সম্পদ। কেননা তাঁদের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। যোগ্য প্রতিনিধি, দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। অসৎ পন্থা বা প্রলোভনে সহায়তাকারী ভোটার কখনো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে পারে না। এ ধরনের অসচেতন ভোটারের কারণে দেশের ক্ষতি হয়।

নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার ও নাগরিক উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে সরকার নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে জনগণ, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ এর বিকল্প নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই করে থাকে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার এ জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে-

সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন

ভোটার হলো নির্বাচনের প্রাণ। ভোটার তালিকাতে সঠিকভাবে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের অন্তর্ভুক্তি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময়

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় করে সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সকল মত ও পথের দলগুলির আস্থাভাজন হতে পারার মধ্যেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অনেকাংশে নিহিত থাকে।

দক্ষ কর্মী তৈরি

নির্বাচন কমিশনের পরিসর অনেক বৃহৎ। কিন্তু প্রায়শই দক্ষ জনবলের অভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সঠিক সময়ে যথাযথভাবে হয় না। ভোটাররা নানাভাবে হয়রানির স্বীকার হয়। তাছাড়া নির্বাচনি আচরণবিধি, আইন-কানুন সম্পর্কেও হালনাগাদ তথ্য অনেকের জানা থাকে না।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যথাযথ সমন্বয়

সাংবিধানিকভাবেই শাসন বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই নানা কারণে স্থানীয় প্রশাসন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের সময় একটি সমন্বয়হীনতার অভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচন কার্যালয়কে ক্ষমতা অর্পণ করা হলে সমন্বয় সুষ্ঠু হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

ভোটারদের সাথে মত বিনিময়

সচেতন ভোটার নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, শোভাযাত্রা করে ভোটারদেরকে সচেতন করতে পারে। এর ফলে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটাররা উৎসাহিত হয়।

নির্বাচনে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। নির্বাচনের সময়ও নির্বাচন কমিশন আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

তাই বলা যায়, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার অনেক সময়ই নির্বাচন প্রভাবিত করে। তবে নির্বাচন কমিশন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন অনেকটাই সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস

গণঅভ্যুত্থানে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ সরকার পতনের পর সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পঞ্চম সংসদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। তখন সংবিধানে এরকম কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সংবিধানের একাদশ সংশোধনীতে এই বিষয়টির বৈধতা দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান-সংবলিত বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন, ১৯৯৬ সালে পাস হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ ভাগে '২ক পরিচ্ছেদ: নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয়। এতে ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ এর অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ কার্যক্রম ও মেয়াদকালসহ বিস্তারিত বিষয়ে উল্লেখ ছিল। পরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পরে ২০১১ সালের ১০ মে 'আব্দুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ' মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত বিধানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানের অন্যতম মৌল কাঠামো গণতন্ত্র এর সাথে সাংঘর্ষিক। তবে একই সাথে সংক্ষিপ্ত আদেশে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী দুটি (দশম ও একাদশ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে (যা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়) ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন তৎকালীন সরকার।

পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ঐ দুটি ধারা সংক্ষিপ্ত আদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ হাইকোর্ট বিভাগ ঐ ধারা দুটি বাতিল করেন। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আশার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা এখনই ফিরে এসেছে, বলা যাবে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অন্তর্বর্তীকানীন সরকারের মধ্যে তুলনা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার	অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এবং সাময়িক সরকার যা একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিমিত্তে বিশেষভাবে গঠিত হয়।	অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি দেশের রাজনৈতিক সংকট বা সংকটকালীন সময়ে ঐ দেশের সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত হয়।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম সীমিত। তারা কেবল নির্বাচনি প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখা-শোনা করে। তারা কোনো নীতিমালা গ্রহণ বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।	অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি স্থায়ী সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নীতিগত সিদ্ধান্তও নিতে পারে।
মেয়াদকাল সাধারণত ৯০ দিন।	নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়াদকাল বজায় থাকে।
অরাজনৈতিক ও নির্দলীয়।	বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে।
উদাহরণ: গণঅভ্যুত্থানে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ সরকার পতনের পর সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পঞ্চম সংসদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকার, ৩০ মার্চ, ১৯৯৬ – ২৩ জুন, ১৯৯৬ পর্যন্ত বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার, ১৫ জুলাই, ২০০১ – ১০ অক্টোবর, ২০০১ পর্যন্ত বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার।	উদাহরণ: ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার, সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের পতনের পর মোহাম্মদ আল-বশিরের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গঠন এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

০২। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে নির্বাচনি আচরণ সম্পর্কে কী কী বিধান রাখা হয়েছে?

০৩। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক গঠন এবং কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।

০৪। নির্বাচন ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ করতে কি কি সংস্কার করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

০৫। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. আনুপাতিক নির্বাচন কী? বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় আলোচনা করুন। ২০

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। একটি নির্বাচনি ব্যবস্থা কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায্য তার উপরই একটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভর করে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে দীর্ঘকাল ধরে ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (সংসদীয় আসনভিত্তিক নির্বাচন) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এটি আমাদের নির্বাচনি সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যোগ করলেও এটির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই পদ্ধতিতে ভোটের অনুপাতে আসন বরাদ্দ না হওয়ায় অনেক প্রতিনিধিশূন্য ভোটার সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি একটি সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে আলোচনায় এসেছে। তবে এর প্রয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্ন।

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি

এটি নির্বাচনি ব্যবস্থার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আসনভিত্তিক কোনো প্রার্থী থাকে না। ভোটাররা দলীয় প্রতীকে ভোট দেন। আসন বণ্টন হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি কোনো দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২০ শতাংশ পায়, তাহলে সেই দল আনুপাতিক হারে সংসদের ২০ শতাংশ বা ৬০টি আসন পাবে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১ টি দেশে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ২টি দেশ (নেপাল, শ্রীলঙ্কা) ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। উন্নত দেশগুলোর সংস্থা অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনভুক্ত (ওইসিডি)৩৯টি দেশের মধ্যে ২৫টি, অর্থাৎ প্রায় ৭০ শতাংশ দেশই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে।

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা ও বাংনাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা

প্রতিটি ভোটের সমান প্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে এফটিপি পদ্ধতিতে যে দল বিজয়ী হন, সে দলই সরকার গঠন করে। ৪৯% ভোটার কোন দলকে ভোট দিলেও সে দল যদি হেরে যায় সেই ভোট কোনো কাজে লাগে না। অন্যদিকে আনুপাতিক পদ্ধতিতে যে দল ৫% ভোট পাবে তারা সংসদে ৫% আসন পাবে। ফলে প্রতিটি ভোটের মূল্য নিশ্চিত হবে এবং ভোটদানের আগ্রহ বাড়বে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর

ছোট দলগুলো যাদের নিজস্ব ভোট ব্যাংক আছে কিন্তু আসন পায় না তাদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। ফলে বাংলাদেশ তার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের পথে এগোবে।

সুষ্ঠু নির্বাচন ও ভোটার আস্থা বৃদ্ধি

IDEA-এর গবেষণা অনুযায়ী, পিআর পদ্ধতিতে ভোট গণনায় স্বচ্ছতা থাকে। তাই জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়, যা বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের নির্বাচন বিতর্কের সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা ও প্রাণহানি কমে যাবে

কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, সন্ত্রাস, ক্যাডারবাহিনী-এ প্রভাব কমে যাবে কারণ একটি কেন্দ্র জিতলেও কিছু আসে না, মোট ভোটের হিসাবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে নির্বাচন হবে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক।

কার্যকর সংসদ সৃষ্টি

এফপিটিপি পদ্ধতিতে বড় দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ছোট দলগুলোকে দুর্বল করে ফেলে। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে বিরোধী আসন পায় তাদের প্রকৃত ভোট অনুযায়ী যা কার্যকর সংসদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

এছাড়া নমিনেশন বাণিজ্য ও টাকার দাপট হ্রাস, আদর্শ ও পলিসির গুরুত্ব বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজ সহিংসতা হ্রাস, সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চ্যালেঞ্জ

সরকারের স্থিতিশীলতা হ্রাস
এই ব্যবস্থায় কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় প্রায়শই জোট সরকার গঠন করতে হয়। জোটের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে।

ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার অভাব
যেহেতু ভোটাররা সরাসরি কোনো প্রার্থীকে ভোট দেন না বরং দলকে ভোট দেন তাই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা কমে যেতে পারে।

নীতি নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি
যদিও আনুপাতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ছোট দলের প্রতিনিধিদের সুযোগ তৈরি হয়, তবে সেই দলগুলোর নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নীতি নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

সাংবিধানিক ও আইনগত জটিলতা
বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও নির্বাচন কমিশনের আইনের বড়সড় সংশোধন ছাড়া পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ঐকমত্য অপরিহার্য, যা অর্জন করা কঠিন হতে পারে।

করণীয়

সংবিধান ও আইনগত কাঠামোর পর্যালোচনা
আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুর পূর্বে সংবিধানের ৬৫(১) অনুচ্ছেদ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এবং নির্বাচন কমিশনের বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ
স্থানীয় সরকার নির্বাচন, জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন (যদি উচ্চকক্ষ অনুমোদিত হয়), থেকে পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর সফলতা যাচাই করা যেতে পারে।

জনসচেতনতা সৃষ্টি
গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সরাসরি আলোচনা করতে হবে।

জোট রাজনীতির রূপরেখা নির্ধারণ
আনুপাতিক নির্বাচনি পদ্ধতি চালু হলে সরকার একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াবে। তাই হর্স ট্রেডিং প্রতিরোধ (টাকার বিনিময়ে দল পরিত্যাগ), সংসদের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য জোট কীভাবে গঠিত হবে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে।

জাতীয় সংলাপ ও রাজনৈতিক ঐকমত্য
রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, সুশীল সমাজ ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন এবং রাজনৈতিক ঐকমত্য সৃষ্টির মাধ্যমে এটি প্রাসঙ্গিক করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে পিআর নির্বাচন পদ্ধতি একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়সংগত অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক হতে পারে। যদিও বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জনসচেতনতা ও দূর দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে কার্যকর করা যেতে পারে।

০২. নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? ১০

শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন ব্যতিরেকে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আশা করা যায় না। বিভিন্ন প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে নির্বাচন পরিচালনা করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কাজেই নির্বাচন কমিশন যাতে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে সে ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো।

কমিশনকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য চারটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, প্রয়োজন কমিশনের কাজের বৈধতা প্রদানের এবং কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য একটি যথাযথ আইনিকাঠামো।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন যোগ্য, স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ দান।

তৃতীয়ত, প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান।
চতুর্থত, প্রয়োজন রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলের সদাচরণ।

এই চারটি বিষয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাস: ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বিতর্কিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন। কাজেই সরকারি এবং বিরোধী দলকে ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব হয়।

আর্থিক ক্ষমতা: নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ক্ষমতা সুসংহত করা প্রয়োজন। কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারে উপর নির্ভর করতে হয়। কমিশনের নিজস্ব তহবিল বা অর্থের উৎস থাকা বাঞ্ছনীয়। ফলশ্রুতিতে আত্মনির্ভরশীল একটি কমিশন পাবে দেশ।

জনবল বৃদ্ধি: কমিশনে লোকবল সংকট থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয় না। কাজেই লোকবল তথা দক্ষ জনবল নিয়োগ জরুরি।

নিজস্ব বাহিনী: লক্ষ্য করা যায় যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কমিশনকে বেসামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হয় এবং অনেক সময় সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব বাহিনী থাকলে তাদের অন্য কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না।

আইন সংশোধন: শক্তিশালী আইন করতে হবে যাতে কমিশনের বিচারিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।আইন এর ফাঁক গলে অপরাধী যাতে পার না পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হ্রাস: কমিশনের কর্মচারী ও কর্মকর্তা যাতে দুর্নীতিতে জড়িয়ে না পড়ে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া যারা দুর্নীতি করে ভাবমূর্তি নষ্ট করে তাদেরকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

নির্বাচনি ব্যয় হ্রাস: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৪৪ ধারায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনি খরচের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন প্রার্থী নির্বাচনে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবে এ সংক্রান্ত বিষয়ের বিধান নির্বাচনি বিধিমালায় রয়েছে। ২০০১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইনের ভিত্তিতে নির্বাচনি ব্যয় উল্লেখ করা হলো-

সংসদীয় নির্বাচন	নির্বাচনের সময়	প্রার্থীদের অনুমোদিত ব্যয়সীমা
অষ্টম	২০০১	৫ লাখ
নবম	২০০৮	১৫ লাখ
দশম	২০১৪	২৫ লাখ
একাদশ	২০১৮	২৫ লাখ
দ্বাদশ	২০২৪	ভোটার প্রতি ১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ লাখ

মামলার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস: নির্বাচন কমিশন বনাম অন্যান্য এরকম অনেক মামলার রায় হতে অনেক দেরি হয়। অসদুপায় অবলম্বন করে অনেকেই নির্বাচনে জয় লাভ করে। পরে যখন মামলা হয় কিন্তু সঠিক সময়ে রায় প্রদানের অভাবে সদস্যপদ বাতিল করা যায় না।

মনোনয়ন বাণিজ্য হ্রাস: মনোনয়ন বাণিজ্য হলো নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কিছু রাজনৈতিক দল বা নেতা নিজেদের প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা, জমি, বা অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ নেওয়া হতে পারে, যাতে তারা দলীয় মনোনয়ন পায়। এটি একটি অনৈতিক ও অবৈধ কার্যকলাপ, যা সাধারণত রাজনৈতিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। মনোনয়ন বাণিজ্যের কিছু প্রভাব হলো- গণতন্ত্রের ক্ষতি, অযোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনে অংশগ্রহণ, দুর্নীতির বিস্তার। মনোনয়ন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

কাজেই সার্বিক দিক বিবেচনা করে বলা যায় যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাণ হলো নির্বাচন এবং বাংলাদেশের মহান সংবিধানের ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন এবং এর দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে কাজেই শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন শুধু একটি দায়িত্ব নয় বরং একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।